নির্মলেন্দু গুণ

কবিতা, অমীমাংসিত রমণী

প্রগতি প্রকাশনী। ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬৭

প্রকাশক
গোলাম ফারুক
প্রগতি প্রকাশনী
১৪৪ নিউমার্কেট
ঢাকা ৫

মুদ্রণে
কল্যাণ সাহা
বর্ণনা
৯ রেবতী মোহন দাস রোড
ঢাকা ১

প্রচ্ছদপট
আঁরি মাতিস অবলম্বনে
কালাম মাহমুদ

হুমায়ুন কবির
শশাংক পাল
আবদুল কাসেম
নিহত কাব্য-সঙ্গীত্রয় ।

সর্বগ্রাসী, হে নাগিনী

আমি চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা ব'লে ভ্রম করি।
রাজবন্দীর হাতের শৃংখল আমার চোখের মধ্যে নারীর শাঁখার মতো
প্রেমের বন্ধন হ'য়ে কাঁপে– আমি ভ্রম করি।

যখন অগ্নির গ্রাসে এক-একটি সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যায়,
আমি সে-ভস্মস্তূপের মধ্যে ঝলসে যাওয়া শিশুর নিষ্পাপ মুখ
কিম্বা সংসারের বিপুল বিনাশ দেখে আজকাল আঁতকে উঠি না।
শুধুই নারীর মৃত্যু সারাক্ষণ জুড়ে থাকে আমার হৃদয়।

এ কেমন নারী-গ্রাস ?
এ কোন্ বিকৃত বোধ আজকাল পেয়েছে আমাকে ?

জনৈকা নারীর গর্ভে প্রথাসিদ্ধ কিছুটা সময় আমিওতো
করেছি যাপন, আমিওতো আপন বোনের পাশে একদিন
শয়ন করেছি–ব'সে ব'সে দেখেছি ধুলোয় শিশুর উল্লাহুনা,
তারার শরীর ছুঁয়ে চোখে চোখে বেড়েছে বয়স।

তখন রমণী মানে অমুণ্ডুমুণ্ডহীনাযোগ্যা সর্বগ্রাসী নাগিনী ছিল না,
তখন রমণী মানে রক্ত কাঁপানো সুখে বুকে মুখে চুমু-খাওয়া
অফুরন্ত বাসনা ছিল না, তখন রমণী মানে অন্যকিছু ছিল।

এ কেমন নারী গ্রাস ?
এ কোন্ বিকৃত বোধ আজকাল পেয়েছে আমাকে ?
আমি চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা ব'লে ভ্রম করি।
নারীর মৃত্যু ছাড়া কোনো মৃত্যু স্পর্শ করে না,
মাতা নয়, শিশু নয়, গণহত্যা নয়, কেবলই নারীর মৃত্যু
সারাক্ষণ জুড়ে থাকে আমার হৃদয়।

ওটা কিছু নয়

এইবার হাত দাও, টের পাচ্ছো আমার অস্তিত্ব পাচ্ছো না ?
একটু দাঁড়াও, আমি তৈরী হয়ে নিই।

এইবার হাত দাও, টের পাচ্ছো আমার অস্তিত্ব ? পাচ্ছো না ?

তোমার জন্মান্ধ চোখে শুধু ভুল অন্ধকার। ওটা নয়, ওটা চুল।
এই হলো আমার আঙুল, এইবার স্পর্শ করো—না, না, না,
ওটা নয়, ওটা কণ্ঠনালী, গরলবিশ্বাসী এক শিল্পীর মাটির ভাস্কর্য ;
ওটা অগ্নি নয়—অই আমি, আমার যৌবন।

সুখের সামান্য নিচে কেটে ফেলা যন্ত্রণার কবন্ধ প্রেমিক।
ওখানে কী খোঁজ তুমি ? ওটা কিছু নয়, ওটা দুঃখ—
রমণীর ভালোবাসা না পাওয়ার চিহ্ন বুকে নিয়ে ওটা নদী,
নীল হয়ে জমে আছে ঘাসে, এর ঠিক ডানপাশে অইখানে
হাত দাও,—হাঁ, ওটা বুক, অইখানে হাত রাখো, ওটাই হৃদয়।

অইখানে থাকে প্রেম, থাকে স্মৃতি, থাকে সুখ, প্রেমের সিম্ফনি,
অই বুকে প্রেম ছিল, স্মৃতি ছিল, সব ছিল, তুমিই থাকো নি।

সহ্যসীমার মধ্যে

বাবা আমার কাছে এখন মাঝে মাঝে টাকার জন্য চিঠি লেখেন,
আমি ডাকঘরে যাই।

আমাকে আসতে দেখে রেস্তোঁরার যে-কোনো বেয়ারা এখন
সানন্দে আদাব ঠোকে—সোল্লাসে স্বাগত জানায়
আপততঃ তরুণ বন্ধুরা, আমি টাকা ধার দিই অনায়াসে।
গাছ-পাখি-ফুল-নারী, আমি কারো কাছে ঋণী নই।

আমার বেকার বন্ধুরা আমাকে বিব্রত করে, আমি বিরক্ত হ'য়ে
টেলিফোনে জনৈক মন্ত্রীর সাথে কথা বলি। তারা খুশি হয়।

যে-কোনো পুস্তক প্রকাশক এখন আমার কৃপাপ্রার্থী, যে-কোনো মস্তান
এখন আমার মন্ত্রমুগ্ধ, একান্ত অনুগত, বাধ্য বশংবদ।
সম্প্রতি দু'একটি ফিল্‌মী গীত রচনার অফার পেয়েছি, আমি রাজী নই।
'কত টাকা চাই—আসুন আমার ঘরে"-ব'লে ডাকে হাজার দুয়ার;
আমি চিনতে পারি না, বুঝি লোভ, সেই জন্ম-প্রলোভন
যে আমাকে অন্ধকারে হাত ধ'রে টেনে টেনে তুলছে সিঁড়িতে।

আমার এলাকাবাসীরা চায় আমি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হই,
তারা গণভোট দেবে, কেননা আমি এখন সবচে' বিশ্বাসী, প্রতিদিন
সৎ এবং শক্তিশালী হচ্ছি। কুমারী স্তনের মতো বক্ষময় বৃদ্ধি পাচ্ছে,
আলৌকিক আমার ক্ষমতা। তোমার যে-কোনো উপেক্ষাই
এখন আমার সহ্যসীমার মধ্যে, তুমি করতলগত, করতলে গত।

রক্তাপ্লুত গর্ভপাত

অন্য পাঁচজন কী করতো সে আমার জানবার কথা নয়,
আমি যে চিৎকার করতাম সেটুকুই জানি।
আমার চিৎকার থেকে জলোচ্ছাস হতো, ভূমিকম্প হতো,
পৃথিবীতে বিশ্বযুদ্ধ হতো, সেটুকুই জানি।

অন্য পাঁচজন কী করতো সে আমার জানবার কথা নয়,
আমি জানি আমার চিৎকারে জননীর রক্তে-মাংসে
হুলস্থূল হতো। আমি জননীর স্ফীতোদরে ছিলাম অবৈধজাত
ভ্রূণলগ্ন সন্ত্রাসের মতো। অন্য পাঁচজন কোথায় ছিলেন,
কীভাবে ছিলেন, সে আমার জানবার কথা নয়।

মা আমাকে যতোবার ভ্রূণের ভিতরে হত্যা করতে
উদ্যত হয়েছে, আমি ততোবার আমার আসন্ন হাতে
জননীর জরায়ুতে প্রাণপণ আঘাত করেছি, প্রতিবাদে
চিৎকার করেছি। আমি যে চিৎকার করতাম সেটুকুই জানি।

অন্য পাঁচজন কী করতো, সে আমার জানবার কথা নয়।
আমি আজো মৃত্যুভয়ে ভীত—যখনই জরায়ু দেখি
রক্তাপ্লুত গর্ভপাত মনে প'ড়ে যায়। আমি আজো জন্মলোভে
প্রাণভয়ে চিৎকার ক'রে উঠি—'সাবধান! আমি আসছি'।

পার্ক রোডে ঘুম

মানুষের মতো আর আজকাল ঘুমোতে পারি না। একটি নিজস্ব
ঘুমরীতি আবিষ্কার করেছি সম্প্রতি। একদিন একটি কালো
কোকিলের বাসায় ঘুমিয়েছিলাম, তাঁরই কাছে শেখা এই ঘুমরীতি।

গাছের পাতার ফাঁকে পূর্ণিমার চাঁদের মতন শুয়ে থাকা, ঝুলে থাকা।
ভারী সুন্দর, সহজ কিন্তু ভীষণ গভীর! একদিন একজন গণিকার
ঘরে আমি সারারাত, অর্থাৎ জীবনের দীর্ঘতম রাত যাপন করেছিলাম।
রাত্রির শেষ দিকে আমাদের ক্লান্ত, অবসন্ন চোখে মৃত্যুর ঘুম নেমেছিল,
ভারী সে সুন্দর, কালো কিন্তু তুলতুলে স্নিগ্ধ কিন্তু কামার্ত,
তাঁরই কাছে শেখা।
বেশ সহজ সে কিন্তু ভীষণ গভীর। একদিন প্রথম জন্মের ধাঁচে উন্মাতাল

মদের নেশায় আমি পরিত্যক্ত অবৈধ শিশুর মতো হয়ে তোমার বাড়ির
পাশে, পার্ক রোডে, আহ্ কী মধু, অমৃত ছিল সেই ক্লান্ত ঘুমের গহবরে—
কিছুটা শক্ত অথচ মায়াবী, কিছুটা ট্রাজিক কিন্তু মনোহর,
বেশ সহজ কিন্তু ভীষণ গভীর। তাঁরই কাছে শেখা, কোকিল-গণিকা-পার্ক

রৌদ্রপোড়া মাটির শরীরে মাথা রেখে তরুণ চুল্লির দাহ বুকে নিয়ে
শিখেছি নতুন ঘুম। ভারী সুন্দর এ ঘুমরীতি। কালো কিন্তু তুলতুলে,
শিক্ষিতা কিন্তু সে কামার্ত, অসুন্দর কিন্তু অহংকারী, বেশ সহজ অথচ…

আছে, কেউ আছে

তুমি বলবে সে নেই, আমি বলবো সে আছে,
এখনো কোথাও কেউ অপেক্ষায় আছে।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরে বসে আছে,
অথবা ফুলের মতো বিছানায় ডানা মেলে
ক্লান্ত শুয়ে আছে।

তুমি বলবে সে নেই, আমি বলছি সে আছে,
আমার হেঁয়ার মাঝে অনন্তের বেশ্যা জেগে আছে।

ক্যামেলিয়া

বুকের উপরে তুমি খঞ্জ'—হাতে ব'সে আছো সীমারের মতো।
ক্যামেলিয়া, তুমিও কি ব্যর্থ প্রেম ? তুমিও কি প্রেমের সীমার ?
তোমার উদ্ধত খঞ্জ' আমার চৌচির বক্ষে কোন্ অপরাধে ?
এ-বুকে কিছুই নেই, কিছু নেই, জীবনের ব্যর্থ প্রেম ছাড়া।

তুমি ভুল ক'রে বসেছো এখানে, তুমি ভুল হাতে তুলেছো খঞ্জর।
রসুলপ্রতিম তুমি আমাকে চুম্বন করো—আমি লক্ষ লক্ষ প্রেমে
ব্যর্থ হয়ে, ব্যর্থ হ'তে হ'তে পৃথিবীর ব্যর্থতম প্রেমিকের মতো
ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়েছি, ছুঁয়েছি নিজের মুখ, আত্ম-প্রতিকৃতি।
অব্যর্থ প্রেমের পাত্র পূর্ণ করিয়াছি—তুমি কী কী কেড়ে নিতে চাও

এই নাও প্রিয়তমা, বুকের পাঁজর ঘেষে সমূলে বসিয়ে দাও
প্রেমের খঞ্জর, আমি একতিল নড়বো না। আমার সংরক্ত আত্মা
রক্তের প্লাবনে ভেসে নারীর ক্লেদের মতো অন্ধকারে বেরিয়ে আসুক,
আমি আলোর জোনাকি হয়ে ব্যর্থ প্রেমের পাশে চিতা সেজে রবো।
ক্যামেলিয়া, তুমিও কি ব্যর্থ প্রেম ? তুমিও কি প্রেমের সীমার ?

সাড়ে তিন হাত চিতা

নদীর দু'পাশে ছিলে, উঠে এলে বুকের ভিতরে।
আমি কাকে দোষ দেবো ? নদী না চিতার অগ্নি ?
কাকে ? কার দোষ ? এ দোষ নদীর নয়, এ দোষ চিতার নয়,
এ দোষ নারীর নয়—এ দোষ আমার।

কাঠের যা প্রাপ্য ছিল, নদীর যা প্রাপ্য ছিল, সেই প্রাপ্য
ছুঁয়েছে আমাকে। আমিই সে প্রজ্বলন্ত চিতার ললাটে
চুমু খেয়ে একদিন বেদনাকে বলেছি বিলাস।
যেভাবে ডাহুক ডাকে সেইভাবে একদিন ডেকেছি নারীকে,
সেই-ই আমার দোষ, সেই-ই আমার প্রিয় দুর্বলতা।

আরো কাছে, বুকের ভিতরে, রক্তিম চৈতন্যে, শীতে,
মস্তিষ্কের রক্তে রক্তে,
স্নায়ুর তন্ত্রীতে এসো,
তোলো ঝড়,
বৃষ্টি হোক…

যেহেতু বৃষ্টি ছিল আমার কাংক্ষিত, আগুন আমাকে নিলো।
যেহেতু রমণী ছিল আমার অন্তিম, আমার যৌবন ছুঁয়ে
সব নারী হয়ে গেলো কাঠ, হয়ে গেলো চিতা।

আমি কাকে দোষ দেবো ? আমি নিজে দাহ্য বস্তু হ'য়ে
কী ক'রে বলতে পারি এ দোষ কাঠের, এ দোষ চিতার ?
এ দোষ কাঠের নয়, এ দোষ নদীর নয়—এ চিতা আমার প্রাপ্য।
এই চিতা আমাকে মানায়। সাড়েতিনহাত প্রজ্বলন্ত কাঠ
আমার বুকের মধ্যে জ্বলছে, জ্বলুক, জ্ব'লে পুড়ে ছাই হোক,
একদিন খুলবে কপাট।

প্রত্যাখানের পালা

তুমি আমার চুম্বন ফিরিয়ে দিয়েছো, তুমি পাপী;
ফুলের উপমা শুনে ফিরিয়ে নিয়েছো চোখ
তুমি দুঃখী হবে,—পাপ আর দুঃখ দিয়ে
তোমার সংসার হবে বাঁধা।

তুমি অভিশাপ দেবে ?
দাও. সর্বশক্তিমান যিনি তিনি তো জানেন,
আমি নিষ্পাপ, নির্দোষ, তুমি পাপী,
এ-পাপ তোমার।

আমার চুম্বন স্পৃহার মধ্যে শুধু প্রেম ছিল,
অভিজ্ঞতা ছিল.—উপমার মধ্যে শুধু চিত্রকল্প ছিল,
ছিল শব্দ, ছিল ধর্ম, আর কিছু নয়।
তুমি আমার চুম্বন ফিরিয়ে দিয়েছো, তুমি পাপী,
তুমি ফিরিয়ে নিয়েছো চোখ—তুমি দুঃখী হবে,
এ-দুঃখ তোমার।

তুমি কোন্ মুখে অভিশাপ দাও ? তুমি কোন্
সাহসে তাকাও এই শুভ্র আকাশের দিকে ?
ওখানে ঈশ্বর থাকেন, ঈশ্বর আমার মধ্যে,
আমি তাঁর নতুন বিন্যাস। আলিঙ্গন ছিঁড়ে ফেলে
তুমি ভুলে তাকেই ছিঁড়েছো।
আমাকে ফিরিয়ে দিলে ? এ তোমার পাপ…

নৈশ প্রতিকৃতি

ঐ যে ছায়ার মতো একটি মানুষ পথ হাঁটে, তাকে চেনো ?
হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার। তাকে চেনো ?
ঐ যে ছায়ার মতো বাউলের অবিন্যস্ত চুল, পরম বন্ধুর মতো
দু'টি পা, দু'টি চোখে দু'টি দ্বিধা, তাকে চেনো ?
ঐ যে ছায়ার মতো একটি পুরুষ মধ্যরাতে, কাকভোরে, কবরের
পাশ দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে গ্রীণ লেনে ফেরে, তাকে চেনো ?

ঐ যে উজ্জ্বল মূর্তি একটি যুবক কৃত্রিম প্রেমিক সেজে সারাদিন
নারী সঙ্গে চুর হয়ে থেকে রাত্রি এলে গণিকার স্তন্য চুষে খায়,
তাকে চেনো ? ঐ যে ছ'ফুট দীর্ঘ সীমাহীন অসীম আগুন !

হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার। সম্প্রতি সে
তীব্রভাবে আসক্ত নেশায়। প্রভাতে প্রেমের যোগ্য, পূজার চন্দন,
কোমল কুমারী চোখ, সলজ্জ রক্তিম নাকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম,
দেখে ভুলে মনে হবে এ-কোনো ঋষির পুত্র, অসম্ভব নারীর প্রেমিক।

অথ চ সূর্যের তাপে রক্তের বীর্য গ'লে গেলে পাকস্থলী নেচে উঠে
গাঁজা মদ মোহের নেশায়, ড্রাগের ড্রাগণ যেন চেপে বসে ঘাড়ে।
ঘুঘুর চোখের মতো তার ক্লান্ত দু'টি চোখ লাল গোল বৃত্ত হ'য়ে যায়,
তাকে চেনো ? মাতৃহীন যে যুবক রাত্রি এলে গণিকার স্তন্য চুষে খায় ?

হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার

নিজের অগ্নির কাছে ফিরে

বাড়ি যাবো ব'লে মন স্থির ক'রে আমি তেজগাঁয়
গাড়িতে উঠেছিলাম। যাওয়া হয় নি।
মাঝপথে, ধীরাশ্রমের খা খা শূন্যতায় প্রাচীন পাহাড় থেকে
ভেঙে পড়া এক টুকরো অর্থহীন পাথরের মতো
আমি দ্রুত নেমে গিয়েছিলাম।

অথচ যে-রৌদ্র আমাকে আকর্ষণ করেছিল
তার সাথে কোনো কথা হয় নি।
যে-শূন্যতা আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল,
বিভ্রান্ত করেছিল, তারও সঙ্গে না।

যুদ্ধের সৈনিক হবো ব'লে আমি একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে
গিয়েছিলাম। আমার যুদ্ধ করা হয় নি।
আমি শত্রুর বাংকার ছেড়ে, সীমান্তে রক্তের নদী দেখে
গেরীলার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

যে জলদেবী আমাকে আহবান করেছিল
তার পঁচিশবছরের সঞ্চিত অভিমান
আমার চোখের জলে যুক্ত হ'য়ে স্বপ্নের স্রোতে ভেসে গেছে।
আমি তার মুখোমুখি নিষ্পলক তাকিয়ে থেকেছি।
কোনো কথা বলা হয় নি।
যে আমার ক্ষতচিহ্নে কোমল স্পর্শ রেখে একদিন
বহু বেদনায় বলেছিল; 'হবে' তারও সঙ্গে না,
তারও সঙ্গে না।

মুক্তি-বাহিনীর কালো জীপ থেকে ছিটকে পড়া
বুলেটের মতো রাজপথে গড়াতে গড়াতে একদিন
জনতার স্বাধীনতার মিছিলে গিয়েছিলাম—

যে মিছিল বধূ হ'য়ে একদিন আমাকেও
কাছে ডেকেছিল-তার সঙ্গে কোনো কথা হলো না,
যে জনতা আমাকে কবি বানিয়েছে তারও সঙ্গে না।

আমি মাঝপথে ফিরে এসে শব্দহীন মধ্যরাতে
আমার আত্মার সাথে, দুঃখ-জ্বালা-দহনের সাথে
একা একা আলাপ করেছি। আত্মায় আগুন জ্বেলে
রাজনীতি, ধর্ম, প্রেম, মুক্তির ইশ্‌তাহার পুড়িয়ে ফেলেছি।

পিতা মাতা ভাই বোন প্রিয় পরিজন সময়ের অর্থহীন
স্রোতে ভেসে গেছে—পদ্মস্পর্শে যে কাগজ প্রতিদিন
পদ্য হয়ে ওঠে, তার সঙ্গেও কথা বলা হলো না,
যে নারী নিবৃত্ত করে যৌবনের প্রজ্জ্বলন্ত ক্ষুধা—তারও সঙ্গে না!

কবিতার ছেলে

আমার দৃষ্টিতে নারী, এরকম একটি কবিতা আমি
বালিশের নিচে লিখে লুকিয়ে রেখেছি বহুদিন।

রাত্রি তাঁকে দুঃখ দিতো, দুঃখ তাঁকে সঙ্গ দিতো,
সঙ্গ দিতো সঙ্গম, সন্তান—এরকম একটি কবিতা
দুঃখসঙ্গসুখযুক্ত বিভিন্ন বিষয় এতে ছিল, তবে
কোনো সেরকম বৈষণ্যের প্রধান্য ছিল না।

আমার আঁতুর-ঘরে একদিন ছেলে হলো তার।
দেখতে ঘড়ির মতো, অবিকল যেরকম আমার ঘড়িটা
রেগে গেলে নারী দেখে ঢংঢং ক'রে বাজে, সেরকমই
জ্বলে তারও চোখ—'ক'টা বাজে? কে তোমার বাবা

তুলোর বালিশ ছিঁড়ে জন্মের জল ঝ'রে পড়ে,
কবিতার ছেলে কাঁদে...ঢংঢংঢং, টিক্‌টিক্‌টিক··

কিছু কিছু শব্দ

এমনও শব্দ আছে যা সেই তীব্র তীক্ষ্ণ বুলেটের মতো
বক্ষকে বিদীর্ণ ক'রে দেয়ালের পলেস্তারা স্পর্শ ক'রে যায়।

এমনও শব্দ আছে উচ্চারণে আর্তি থেকে আত্মা উঠে আসে।
সোনার কুঠার হাতে অতল সমুদ্র থেকে উঠে আসে দেবী,
উঠে আসে অশ্বমুখ, সিংহবাহনযুক্ত যুবতীর আশ্চর্য ভৈরবী।

এমনও শব্দ আছে যা সেই তীব্র তীক্ষ্ণ বুলেটের মতো
জীবন বিদীর্ণ ক'রে মৃত্যুর পলেস্তারা স্পর্শ ক'রে যায়,
উচ্চারণে কাঁপে স্বর্গ, শব্দের যোনির মধ্যে দুঃখ ডুবে যায়।

প্রশ্নাবলী

কী ক'রে এমন তীক্ষ্ণ বানালে আঁখি,
কী ক'রে এমন সাজালে সুতনু শিখা ?
যেদিকে ফেরাও সেদিকে পৃথিবী পোড়ে।
সোনার কাঁকন যখন যেখানে রাখো
সেখানে শিহরে, ঝংকার ওঠে সুরে।

সঠাম সবুজ মরাল বাঁশের গ্রীবা
কঠিন হাতের কোমল পরশে জাগে।
চুম্বন ছাড়া কখনোও বাঁচে না সে যে।
পুরুষ চোখের আড়ালে পালাবে যদি
কী লাভ তাহলে উর্বশী হ'য়ে সেজে।

বৈধ প্রেমের বাঁধন বোঝ না যদি
কী ক'রে এমন শিথিল কবরী বাঁধো ?
চতুর চোখের কামনা মিশায়ে চুলে
রক্তপার পাথর বাঁধানো হার
ছিঁড়ে ফেলে দাও—স্বপ্নে জড়াও ভুলে।

কী ক'রে এমন কামনা বাসনা হারা
তাড়িত সাপের তড়িৎ-ফনার মতো
আপন গোপন গহনে মিলাও ধীরে ?
বিজলী উজল তিমির বিনাশী শিখা
যেদিকে ফেরাও সেদিকে পৃথিবী পোড়ে।

করুণাকে

ভাগ্যিস্ টুকু ব'লে তোমারও অন্য একটা ডাকনাম ছিল।
মসজিদে আজান শুনে এখনো সন্ধ্যায় তুমি যেই
ঘোমটা দিয়ে নতুন বধূর মতো দ্রুত হেঁটে যাও,
আমি তক্ষকের ডাকের আড়ালে ব'সে
তোমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে প্রাণভ'রে ডাকি
টুকু…টুক্…টুক্…।

আমার প্রেমের স্বর লুক্কায়িত, তক্ষকের চিৎকারের মতো
সীমাবদ্ধ, নিঃসঙ্গ গুহার দিকে মুখ।
তোমার গন্তব্যে ফিরো তুমি, নিতম্বের ভারে ক্লান্ত নম্র পদযুগ
রক্তে মাংসে অনিঃশেষ ছায়া ফেলে যায়।

তোমার আসল নাম করুণা হলেই ভালো হ'তো,
আমি চিৎকার ক'রে মুয়াজ্জিনের মতো ডাকতে পারতুম
করুণা . করুণা . ?

তুমিও করুণা ক'রে তাকাতে পেছনে, হ'তে বধূ,
এ যেনো তক্ষক নয়, পরিচিত পুরুষের ডাক
বারবার শোনা…করুণা…,করুণা…,

বারিষণ মুখরিত, একদিন

আকাশ থেকে ফস্‌কে গেছে হাত,
অবাধ্য প্রেম এসেছে আজ কাছে।
ফস্‌কে-যাওয়া হাতের কালো দাগ
কাজল মাখা চোখের জলে নাচে।

অয়েলক্লথে মোড়ানো রিক্‌শায়
আবাধ্য সে প্রেমের পাশে ব'সে
ফিরেই দেখি পাথর দিয়ে গড়া
আমার এ-ঘর অথৈ জলে ভরা।

নৌকা হয়ে জলের বিছানাটা
ভাসছে যেন সুখের ঋতু তার,
সীমানাহীন নদীর কাছাকাছি
যাচ্ছে ভেসে একাকী সংসার।

অন্ধকারে গোল বাঁধালে তুমি
দেখতে এসে আটকে গেলে রাতের
আগুন ছোঁয়া নগ্ন নারীর মতো
আমায় তুমি নাড়ালে সংঘাতে।

কোমল কাম ভিজিয়ে লাল জলে
সন্ধিমুখে ছড়ালে সন্ত্রাস।
ভিজে আকাশ কাঁপলো থরথর
কাঁপলো সে কি খুনের অভিলাষ ?

উল্টোরথ

শুধু চোখে নয়, হাত দিয়ে হাত,
মুখ দিয়ে মুখ, বুক দিয়ে বুক,
ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট খোলো, এইভাবে
খুলে খুলে তোমাকে দেখাও।

শুধু চোখে নয়, নখ দিয়ে নখ,
চুল দিয়ে চুল, আঙুলে আঙুল,
হাঁটু দিয়ে হাঁটু, উরু দিয়ে উরু,
আর এটা দিয়ে ওটাকে ঠেকাও !

শুধু চোখে নয়, চোখে চোখে চোখ,
বাহু দিয়ে বাহু, নাভি দিয়ে নাভি।
চাবি দিয়ে তালা খোলা দেখিয়াছি,
তালা দিয়ে খোলো দেখি চাবি ?

মৃত্যু

কাল যদি মৃত্যু হয় আজ তবে পূর্বাভাস হোক,
আজ যদি মৃত্যু হয় আজ তবে পূর্বাভাস হোক।

রাত যদি মৃত্যু হয় সন্ধ্যা শুধু ব'লে দিক—'আসে'।
আসন্ন মৃত্যুর ধ্বনি গোধূলি বেলায় যেন শনি, যেন এই
রুগ্নভগ্নবক্ষ জুড়ে বাজে। যেন দেবতার গ্রাস হ'য়ে
সমুদ্রের মাঝে সব বোধ ডুবে যায় রাখালের মতো।
টের পাবো। হে সুনীল সন্ধ্যা, তুমি ব'লে দিও—আসে।

দিনে যদি মৃত্যু হয়, রাত্রি তুমি ব'লে দিও ডেকে,
যেভাবে দাগীর বউ স্বামীর চোখের জলে পুলিশের
পদচিহ্ন দেখে ব'লে দেয়ঃ 'কাল হবে, জীপের আওয়াজ
ভেসে আসে, ভেসে আসে হাতকড়া, শেষ শোনা গান,
ভেসে আসে লালচিতা—লেলিহান ভোরের আজান।'

কাল যদি মৃত্যু হয় আজ তবে পূর্বাভাস হোক।
রাত যদি মৃত্যু হয় সন্ধ্যা তবে ব'লে দিক—আসে;
ঐ আসে পূর্ণ প্রেম, ঐ আসে অনন্ত সঙ্গম—লীলাভূমি,
ভেসে আসে বিষবৃক্ষ, হেমলক, লতার লাবণী, মৃত্যু
হাতকড়া, লালচিতা, জীপের আওয়াজ ঐ আসে, ঐ আসে...

মধ্যরাত্রির সংকট

কলকাতা ঘুরে আসা ক্লান্ত স্যুটকেস
খট্ খট্ শব্দ ক'রে আমাকে জাগায়।
নারীর চিৎকার শুনে ভেঙে যায় স্মৃতির
বিভ্রম—বুঝি কোনো বড় চাবি জোরামলে
ঢুকে গেছে ভুলে ছোট তালার ভিতরে,
তার চিৎকার। মধ্যরাত এমনি ভীষণ।
একবার ঢুকে গেলে খোলে না সহজে।

লেগে থাকে, ঝুলে থাকে, গিলে গিলে খায়,
যেন রাহু চাঁদ খাচ্ছে, ভাজা মাছ খেয়ে যাচ্ছে
মাধ্যরাতে পালিত বিড়াল। আমিও উৎসাহ
দিই, বলি ঃ 'খাও, যতো পারো খেয়ে নাও,
হে পুরুষ হে যৌবন এইতো সময় যায়,
উত্তেজনার ফেণা রক্তে ভেসে যায়।'

আমি শুয়ে শুয়ে দেখি, শুধু দেখি। আমি
শুয়ে শুয়ে শুনি, শুধু শুনি। আমি শুয়ে
শুয়ে ভাবি, শুধু ভাবি—এইসব মধ্যরাত
কখনো কি তোমাকে দেখে না?

তুমি

কী নাম তোমাকে দেবো, কোমলগান্ধার নাকি
বসন্তের অন্ধকারে পথ হারা পাখি?
'কামনা তোমার নাম'—বলতেই লজ্জামাখা আঁখি
তুমি ঢেকেছো আঙ্গুলে।

তারপর প্রেম এসে চুপিচুপি চুলে যেই বসেছে তোমার
"বিদিশা বিদিশা'-ব'লে আমিও আবার
কাছে আসিয়াছি। তোমার দুরন্ত দেহে ছুঁয়েছি বকুল,
সমুদ্রের ঝড়ো রাতে অনায়াসে ভেসে যাওয়া খড়কুটো
পাপের আঙ্গুল তুমি ফিরালে না কেন?

তুমি কি কখনো চাও নাটোরের বনলতা হ'তে?
অথবা আমার রক্তে পদ্ম হয়ে ভাসতে মৃণাল?
কাছে এসো প্রিয়োতমা, কাছে এসো প্রিয়া...
ব'লে যেই নগ্ন হাতে ডেকেছি তোমাকে
তুমি কেন পরিপূর্ণ হৃদয় সঁপিয়া
প্রেমের দুর্বল লোভে ঝাঁপ দিতে গেলে
যৌবনের অনির্বাণ অসীম চিতায়?

কী নাম পছন্দ করো? পদ্মাবতী নাকি ক্লান্তি?
কী নাম তোমাকে দেবে? বলো, কোন্ নাম!
যদি বলি তুমি লজ্জা, লাজুক পাতার মতো প্রিয়,
ম্রিয়মান, তবে কেন লাজ ভেঙে শিশিরের সামান্য ছোঁয়ায়
মধ্যরাতে জেগে ওঠো লজ্জাহীনা হয়ে?

মাঝে মাঝে মনে হয় তুমিও ঘৃণার যোগ্য,
লাজহীন, অসুন্দর, ভীষণ কুৎসিত এক নারী।
লজ্জা নয়, আঁখি নয়, কোমলগান্ধার নয়,
বাসন্তী, বিদিশা নয়, ক্ষুধা কিম্বা ঘৃণা ব'লে ডাকি।
মাটির মূর্তির মতো ভেঙে ফেলি আঘাতে আঘাতে
ঠোঁট থেকে ফেরাই চুম্বন,
বাহুর বন্ধন থেকে ঠেলে দিই দূরে...

কে যেনো ফেরায় তখন, প্রতিবাদ ওঠে অন্তঃপুরে।
আমি বুঝি বড়ো লজ্জাহীন, কঠিন নির্মম এই খেলা
ভালোবাসা, কী নাম তোমাকে দেবো ?

তুমিতো আমারই নাম, আমারই আঙুলে ছোঁয়া
আলিঙ্গনে বদ্ধ সারাবেলা।

আমাকে কী মাল্য দেবে দাও

তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।

এই নাও আমার যৌতুক, একবুক রক্তের প্রতিজ্ঞা।
ধুয়েছি অস্থির আত্মা শ্রাবণের জলে, আমিও প্লাবন হবো,
শুধু চন্দনচর্চিত হাত একবার বুলাও কপালে।
আমি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে উড়াবো গাণ্ডীব,
তোমার পায়ের কাছে নামাবো পাহাড়।
আমিও অমর হবো, আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।

পায়ের আঙুল হয়ে সারাক্ষণ লেগে আছি পায়ে,
চন্দনের ঘ্রাণ হয়ে বেঁচে আছি কাঠের ভিতরে ?
আমার কিসের ভয় ?
কবরের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই কবর,
শহীদের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই শহীদ,
আমার আঙুল যেন শহীদের অজস্র মিনার হয়ে
জনতার হাতে হাতে গিয়েছে ছড়িয়ে।
আমার কিসের ভয় ?
আমিও অমর হবো, আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।

এই দেখো অন্তরাত্মা মৃত্যুর গর্বে ভরপুর,
ভোরের শেফালি হয়ে প'ড়ে আছে ঘাসে।
আকন্দ-ধুন্ধুল নয়, রফিক-সালাম-বরকত-আমি—
আমারই আত্মার প্রতিভাসে
এই দেখো আগ্নেয়াস্ত্র, কোমরে কার্তুজ,
অস্থি ও মজ্জার মধ্যে আমার বিদ্রোহ,
উদ্ধত কপাল জুড়ে যুদ্ধের এ-রক্তজয়টিকা।
আমার কিসের ভয় ?
তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।

কবি ও নারী

কোনো কিছু না বলতেই
তুমি বোললে; 'চিনি, পড়েছি
কবিতা, কাগজে দেখেছি ছবি,
শুনেছি লোকের মুখে খুব ভালো কবি।'

আরেকটু এগিয়ে যেতেই
তুমি বোললে: 'না,
আমি কোনো কবিকে চিনি না।'

জন্মদিন

আমি সবকিছু দেখতে দেখতে যাই,
গাছপালা, নদীর ভাঙন দৃশ্য, পথঘাট
দেখতে দেখতে যাই।

কোন্‌ নদী ?   কে সে নদী ?   আমি নদী ?   অসম্ভব,
আমি নারীর ভাঙন-দৃশ্য দেখতে-দেখতে যাই।

আমার ভাঙন নেই নদী বা নারীর মতো
আমার দৃশ্য নেই, দেখতে টেখতে নেই—
আমি অন্যের ভাঙনগুলি দেখতে দেখতে যাই।

আমার মৃত্যু নেই, ভাঙন-ভোঙন কিছু নেই…

অগ্নি-উপাসক

দেহের সমস্ত রক্তে লালমদে অবশেষে লেগেছে আগুন।
এখন অস্পৃশ্য কিছু নেই। অদৃশ্য, অনার্য কিছু নেই।

মাটির নিচের নীল মদের পিপায় সে-আগুন ছড়িয়ে পড়েছে,
মশারিতে লেগেছে বাতাস।
কিছুই অগ্রাহ্য নয়, দৃষ্টিগ্রাহ্য সব নারী এখন খড়ের মতো
রক্তদাহ্য হবে। অগ্নির অস্পৃশ্য কোন্ জন ?

আমার এখন একটা হ'লেই চলে। কিছু হ'লেই চলে।

বুকের নিচের কালো পাটাতনে লেগেছে আগুন,
এখন সমস্ত পালে জীবনের অদৃশ্য বাতাস।

আত্মশাসিত চুম্বন

বৃষ্টি যেরকম আসতে আসতে ফিরে যায়,
তেমনি বৃষ্টির মতো বহুবার আমিও ফিরেছি।

বারবার দ্বিধা এসে শাসন ভঙ্গির মতো
দুই ঠোঁটে রেখেছে আঙুল—'কাকে তুই চুমু খাস ?
এ-যে তোর রক্ত-সহোদরা, এ-যে তোর গর্ভধারিণী মা,
এ-যে দুগ্ধপোষ্য শিশু। কাকে তুই চুমু খাবি ?
এ-যে তোর বীর্যজাত কল্পনার আপন কামিনী, কন্যা—।

স্বপ্ন থেকে খ'সে পড়া নক্ষত্রের মতো
আমার চুম্বন ভেঙে মুহূর্তেই ঠোঁট হয়ে যায়।

আমি আসতে আসতে ফিরে যাওয়া
শ্রাবণ বৃষ্টির মতো তাড়িত দ্বিধায় ফিরে আসি,
ফিরে ফিরে আসি, ফিরে ফিরে যাই।

টেলিফোনে তুমি বাজো

ক্রিং ক্রিং শব্দ ক'রে বহুবার বেজেছিল টেলিফোন,
আমি একবারও তুলি নি তোমাকে।

যেন সব গাঢ় প্রেম ক্রিং ক্রিং শব্দে ঝ'রে যায়।
বাজে, বেজে বেজে থেমে যায়, থেমে গেছে,
তারপর রক্তেমাংসে বেজেছে আবার।
ক্রিং ক্রিং শব্দ ক'রে মত্ত টেলিফোন বাজে, শুধু বাজে।

আমি তার ডাক শুনে পেছনে তাকাই, একবারো
তুলি না তোমাকে। শুধু বুঝি তোমার আঙ্গুলগুলো
কী সুন্দর ব্যগ্র হয়ে আমাকেই খুঁজে খুঁজে ঘুরছে ডায়ালে।
বহুদূরে, অন্ধকারে টেলিফোনে জেগে আছো তুমি।

মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে হাত, কেঁপে ওঠে প্রেমের সংঘাত।
তবু তুলি না তোমাকে।
এই কী নারীর কথা ? ভালোবাসা ? ঠোঁটছোঁয়া দাহ ?
কোমল আঙুল থেকে উচ্চারিত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে
কোন্ কথাগুলো ? কোনো কথা ছিল ?

ক্রিং ক্রিং শব্দ করে পাখির কান্নার মতো
টেলিফোনে তুমি বাজো…
আমি একবারো তুলি না তোমাকে।

ভয়

মাংসে চাকুর মতো যন্ত্রণায় গেঁথে আছো তুমি,
যেভাবে গোপনে চাঁদ অন্ধকারে থাকে গাঁথা
আকাশের গায়। রক্ত ঝরে, কখনো ক্ষতের চিহ্নে
বক্ষের পাঁজর বেয়ে ঝ'রে পড়ে পুঁজ, ভন্‌ভন শব্দে ওড়ে মাছি।
তোমার স্মৃতির স্পর্শ বুকে নিয়ে জেগে থাকি রোজ, আজো জেগে আছি।

গলিত মাংসের মধ্যে আমের পোকার মতো তুমি ব'সে কুরে কুরে খাও।
তবু থাক্, মুগ্ধ প্রেম,আমার বুকের মধ্যে আমূল প্রোথিত চাকু
আমি কোনোদিন খুলবো না, যদি তুমি ক্ষরণের রক্তে ভেসে যাও?

যার যা প্রাপ্য

প্রেম তুমি বড়ো হও, নারী তুমি চ'লে যেতে পারো,
অভিমান কাছে এসো, রক্ত তুমি জ্বলো ধীরে ধীরে,
অশ্রু তুমি চোখে যাও, দুঃখ তুমি বুকের গভীরে
এসে বসো। প্রতিধ্বনি, তুমি থাকো অন্ধ ঘুমে
শয়নে, শংকিত বাসনায়।

শুনেছি প্রেমের ডাকে কুমারীর পর্দা ছিঁড়ে যায়,
অপরাহ্ণ নেচে ওঠে চোখের ঝলকে, স্খলিত রক্তের
স্রোত খুঁজে ফেরে খনি। আমার জন্মান্ধ চোখে
এ-জীবন এসবের কিছুই দেখে নি। প্রেম শুধু বড়ো হয়,
দুঃখ শুধু জ্বলে ধীরে ধীরে—সব নারী চ'লে গেলে
অভিমান কাঁদে চোখে, অশ্রুগুলো বুকের ভিতরে
সম্পূর্ণ ভুবন জুড়ে বেড়ে ওঠে লাল-টিউমার।

মৃত্যু তুমি আজকাল কাকে ভালোবাসো?
তুমিও কি প্রতিধ্বনি? ভুল ক'রে ভুলেছো আমায়?
আমাকে সাজাও প্রিয় তোমার পরান যাহা চায়।

কবিতার নিজস্ব নিয়ম

আমি জানি না কী নিয়ম এতদিন প্রচলিত ছিল।
কবিতা লেখার আগে কার নাম উচ্চারিত হতো,
কবিদের অন্তঃপুর কার দিব্যমুখে হতো আলোকিত।
অনুভবে নেচে ওঠা কোন্ চিত্রে চোখ রেখে একে একে
জ্বলে উঠতো চাঁদ, উপমা, প্রবাদ কবিদের।

জানি না কী নিয়ম আজকাল প্রচলিত আছে।

কবিতা লেখার আগে যুদ্ধ মৃত্যু বেঁচে থাকা কিম্বা
বেঁচে থাকা-না-থাকার মধ্যে বেঁচে থেকে আমি শুধু
নারীকে সাজাই। ডাকি—'কাছে এসো, মুখচোখ
স্তনের মানুষ প্রিয়তমা, কাছে এসো,—এ আমার
কবিতার নিজস্ব নিয়ম। আমি এভাবেই ডাকি।
এসো প্রভু, এসো নারী, এসো প্রিয়তমা, এসো।

একটি রমণী আসে, সপ্তপ্রদীপ হাতে নৃত্য ক'রে আসে,
ঝুলন্ত দোলনায় ব'সে পায়ের পাতার মতো আমাকে
দোলায়। কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে থেকে নদীর ভাঙন হয়ে
ঢুকে যায় যমুনার মতো তীব্র চুমুর ভিতরে—তারপর
একটি কবিতা লেখা হলে সেই নারী দ্রুত ফিরে যায়,
ইলেক্‌ট্রিক ফিরে এলে রেস্তোরাঁর অকর্মণ্য মোমের ছায়ায়।

আমি এভাবেই লিখি, এ আমার নিজস্ব নিয়ম, কবিতার

দ্বিধাগ্রস্থ পাপে

আমি নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ কোনোদিন গ্রহণ করি নি,
অপেক্ষায় ছিলাম, সমুদ্র যেমন নদীর অপেক্ষায় থাকে।
নদী যেমন প্লাবনের অপেক্ষায়।
কোনো বোধ পাথুরে খনির থেকে উঠে এসে
প্রেম হয়ে আমাকে জ্বালাবে, এ আশায়।
নিষিদ্ধ নারীকে আমি কোনোদিন ভাবি নি সঙ্গয়।
কোনোদিন স্পর্শ করে দেখি নি সে পাপ।

আমি অপেক্ষায় ছিলাম, বিপ্লব যেমন তার
নিজের ভিতরে ক্রমে ক্রমে সংঘটিত হয়ে অন্তিম
লগ্নের অপেক্ষায় থাকে। ঊধর্বগামী স্তনের উল্লাসে
যুবতীর বক্ষদেশ যেরকম অপেক্ষায় থাকে।

সমুদ্রমন্থনক্লান্ত নাগিনীর মতো একদিন
প্রেম এসে নিজ হাতে শিখাবে মন্থন, এ আশায়
আমি নিষিদ্ধ নারীর স্বাদ গ্রহণ করি নি।

বলে দাও হে তাপস কোন্ পাপে মুক্ত হবো আমি।

রবিবারের গান

আজ রোববার, আজ হলিডে
আজ মেনড্রাক্স শুধু মেনড্রাক্স
আহা মেনড্রাক্স। আজ মাইসেল্ফ
আজ হু-হু হু, আজ হোহ্ হো
আজ হাহ্‌হা
আজ লাল্লা।

আজ চিয়ার আপ্, আজ রোববার,
আজ হলিডে, আজ হরতাল
আজ চাকা বন্ধ। আজ হরতাল,
আজ হাহ্ হা, আজ মেনড্রাক্স।

আজ ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া।
আজ হুররে। শুধু হুর-রে।
আগে জানলে ? আগে জানলে তোর
ভাঙা নৌকায় চড়তাম না,
হায় মেনড্রাক্স।

আজ রোববার, আজ হলিডে
আজ হরতাল, আজ মেনড্রাক্স
আজ হাহ্‌হা
আজ হুর-রে…

শাঁখা

আমি তোমাকে শাঁখা দিতে চাইলাম
তুমি চাইলে অর্থহীন সোনার কাঁকন।

আমি তোমাকে সংসার দিতে চাইলাম
তুমি চাইলে সুসজ্জিত স্তব্ধ অবকাশ ।

আমি তোমাকে চুম্বন দিতে চাইলাম
তুমি চাইলে বনভূমি মনের আড়াল ।

আমি তোমাকে সন্তান দিতে চাইলাম
তুমি চাইলে বাস্তবের বিদীর্ণ পলাশ।

আমি তোমাকে স্বপ্ন দিতে চাইলাম
তুমি তখন ঘুমের ওষুধ কিনে নিলে।

পাথরের সাপ

আমি সূর্য স্পর্শ ক'রে দেখেছি দুপুর,
আমি আকাশের নীল গালে মুখ ঘ'ষে
আকাশ দেখেছি—অপূর্ণ চাঁদের ঠোঁটে চুমু খেয়ে,
দেখেছি পূর্ণিমা। পরীব পাথর ছুঁয়ে
দেখেছি পাহাড়, আমি সাপকেও বুকে নিয়ে
বহুরাত কাটিয়ে দেখেছি। আজ কোনো
স্মৃতি বেঁচে নেই, শুধু মনে আছে একদিন
চিহ্নহীন আমাকে দেখেই তুমি উঠে গিয়েছিলে—
যেন তুমি নিজেই আকাশ, সূর্য, অপূর্ণ-চাঁদের
চোখে পাথরের সাপ,—আমি পাপ।

বলো তুমি প্রেম হবে কোন্‌খানে ছুঁলে।

ঐ যে স্ত্রৈণ যায়

যে আমাকে স্ত্রৈণ বলে বলুক,
আমি অগ্নি সাক্ষী রেখে
তোমাকে বলেছি—স্ত্রী।
চন্দন চিতার বুকে তুমি এসে
শুয়েছো শয্যায়। আমার যৌবন
যাহা চায় তুমি তার সবই এনে
দিয়েছো সাজিয়ে। সহমরণের

স্পৃহা যতবার জ্বলেছে আমাতে,
ততবার জ্বলেছো তুমিও। আমার কী
সাধ্য আছে তোমাকে সাজাই ?
আমি অনন্তকে সাক্ষী রেখে
তোমাকে বলেছি—স্ত্রী।
আমি শুধু স্ত্রৈণ হ'তে চাই।

যে আমাকে স্ত্রৈণ বলে, বলুক।

ফসলবিশ্বাসী নারী

খোলা চুল, বলতেই বৈশাখের সমস্ত মাস্তুল
ভেঙে পড়লো মেঘে, যেন এভাবেই বৃষ্টি হয়,
অন্ধকার আসে।

শরীরে কম্পন জাগে রক্তের গোপন আদেশে
নতুন জোয়াল হাতে নেমে আসে চাষী, শুরু হয়
চাষাবাদ। হে আমার ফসলবিশ্বাসী নারী
আমাকে নতুন তুমি কী শিখাবে বলো ?
আমি সব জানি, সব বুঝি, শুধু বলি না কিছুই,
কিছুদিন চুপ ক'রে আছি। ঐ যে বক্ষজুড়ে যক্ষের
আকন্দ-ধুন্দুল তুমি কতক্ষণ রাখবে লুকিয়ে ?
আমি জানি নারীর অজ্ঞাতসারে খুলে যায়
নারীর শরীর, স্তনের অজ্ঞাতসারে খুলে যায় স্তন,
পুরুষের ভয়ে ভীত কাঁচুলির অযথা বাঁধন
চিরকাল খুলেছে এভাবে।

আমাকে নতুন তুমি কী বোঝাবে বলো ?
আমি সব বুঝি, সব জানি, শুধু বলি না কিছুই,
কিছুদিন চুপ ক'রে আছি। সম্পূর্ণ উলঙ্গ আমি
হইনা কখনো—ব'লে তুমি যতোই চিৎকার করো
আমি জানি কখন সময় হবে, অভিজ্ঞা নারীর মতো

তুমি এসে নিজ হাতে খুলে দেবে সায়া, খুলে দেবে রুদ্ধদ্বার
হে নগ্ন যৌন বেহায়া নারী
আমাকে নতুন তুমি কি দেখাবে বলো ?
আমি সব দেখি, সব শুনি, শুধু বলি না কিছুই,

কিছুদিন চুপ ক'রে আছি। কিছুদিন চুপ ক'রে আছি।

জেনারেল এ্যামনেষ্টি

যখন একটি নারী আমাকে উপেক্ষা হেনে অতিক্রম করে যায়
আমি তার গন্তব্যের দিকে শেষবার ত্বরিৎ তাকাই,
তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলি, হে আল্লাহ্,
তুমি ওকে ক্ষমা করো, ওকে তুমি দুঃখ দিও না।

অতঃপর প্রথাসিদ্ধ এক মিনিটের ক্লান্ত নীরবতা কেটে গেলে
আমি জানি একদিন সব নারী করজোড়ে দাঁড়াবে দুয়ারে ঃ
'ভুল হয়ে গেছে প্রভু, আমি বড়ো দৃষ্টিহীনা তোমাকে দেখি নি ।'

আমি সব নারীকেই ক্ষমা করে দেবো।

গ্রীণ লেনে রাত্রি

বিপুলা এ আঁধারের তুমি কতটুকু জানো ?
কতটুকু রাত তুমি দেখেছো রাত্রির—আমি
তোমার রাতের চেয়ে দীর্ঘতর রাত মধ্যরাতে
ঘরে ফেরা মাতালের মতো নামতে দেখেছি
গ্রীণ লেনে।

আমার নিজের চোখে, কানের দু'পাশ দিয়ে
বজ্রপাতে দগ্ধ তালগাছ পুড়ে পুড়ে নেমেছে
মাটিতে—আমার নিজের চোখে দেখেছি সে
গাঢ় অন্ধকার, কৃষ্ণবিদ্যুৎ যেন মায়ের জরায়ু
ছিঁড়ে ঝলকে বেরিয়ে আসা চিত্রাঙ্গদা,
নিগ্রোব্ল্যাক, এঞ্জেলা ডেভিস্।

রাত্রির চরিত্র নিয়ে কে ওখানে তর্ক করে ?
ওরা কেউ তোমাকে জানে না। আমি আদমের
মতো স্রষ্টার নির্মাণ স্পর্শে অনুভব
করেছি তোমাকে। রাত্রির চঞ্চল হাত
রমণী রমণরত পুরুষের বাহুর মতন ভালবেসে
কেঁপেছে আমাতে। আমার কণ্ঠের নীলে,
গ্রীবায়, বাউলচুলে, চোখের তারায়,
গুম্ফময় শীর্ণ ঠোঁটেও কামুক নারীর মতো
একদিন করেছে চুম্বন। আমি রক্ত চক্ষু মেলে
গ্রীণলেনে দেখিয়াছি পৃথিবীর শেষ অন্ধকার।

কলকাতা : ১৯৭১

খটাং খটাং খট, খটাং খটাং খট,
যেন মধ্যরাতে পালাচ্ছে বিদ্যুৎ—
ডাকাতের দল, ট্রাম-গাড়ি।
খটাং খটাং দুঃখ, খটাং খটাং দীর্ঘশ্বাস
যেন মধ্যরাতে পালাচ্ছে বিনাশ,
প্রিয়তমা, নারী, কলকাতা, ঘরবাড়ি।

আজি হ'তে শতবর্ষ পরে

একটি শয়তান এসে প্রতিদিন প'ড়ে যায় আমার কবিতা।
আমারই পাশের ঘরে একটি রমণী এসে
গোপনে রমণ ক'রে যায়—আমি শব্দ পাই।

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ ব'সে আমার কবিতা ?
যুগলবন্দী নয়, উত্তরে শয়তান কন্ঠ
গণকন্ঠে হাসে—বলে 'আমি'।

'আমি ?' কানে বড়ো বাজে, আমি লাজে অপমানে
ক্ষিপ্র চিতার মতো তাড়া করি তাঁকে। ক্রুদ্ধ হয় আমার
পাঠক, পান্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলে আত্মমুগ্ধ তরুণ তাপস।
ক্লান্ত শ্রমিক যেমন বিস্কিট খাবার আগে ব্যগ্র হাতে
ছিঁড়ে সে প্যাকেট !

একটি শয়তান এসে প্রতিদিন পড়ে যায় আমার কবিতা
একটি যুগলবন্দী আমারই পাশের ঘরে—নিদ্রিত শিশুর
পাশে গোপনে রমণ করে যায়, আমি শব্দ পাই।

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে, তবু শব্দ পাই।

আমার পৃথিবী

সাপের ফণায় নয়, রমণীর স্তনাগ্র চূড়ায় স্থির
আমার পৃথিবী—
অর্থাৎ
সমস্ত
পৃথিবী।
আমি সেই পৃথিবীকে প্রতিদিন কুরে কুরে খাই
খুঁটে খুঁটে খাই—
অর্থাৎ
আমাকেই
খাই।

দুই চোখে জাগা

আমারো ভেঙেছে ঘুম বসন্তের প্রথম চিৎকারে
এখনো আমার চোখ সম্পূর্ণ খোলে নি,
অর্ধেক নিদ্রার মধ্যে, অর্ধেক আলোয়, জাগরণে,
অর্ধেক নারীর যৌবনে, প্রেমে —অর্ধেক
বিকৃতবাসনায়।

তুমি কোন্ সরল বিশ্বাসে আমার দুয়ারে এসে
নাড়া দিলে জীবনের বন্ধ-দরোজায়, হে বসন্ত ?

আমি আর নেই সে মানুষ, আমি আর নেই সেই
গারো পাহাড়ের উদ্দাম বুনো হাওয়ায় প্রস্তুত
সরল তরুণ কোনো যুবা। তোমার চিৎকার শুনে
এতো সহজেই প্রভাবিত হবো, তরলতরুণরক্তে
ধুয়ে দেবো পৃথিবীর জমে ওঠা পাপ, অভিশাপ।

আমি ইতিহাসে মাথা রেখে এতদিন ঘুমিয়ে ছিলাম,
তুমি কোন্ সোনালি বিশ্বাসে
এখনো দাঁড়িয়ে আছো আমার দুয়ারে ?

আমার একটি চোখ এখনো নিদ্রার মধ্যে
স্বপ্নভূক কবি হয়ে আছে। নারীর যৌবনে,
ঘুমে, রক্তের বিকৃত বাসনায়—মদমোহমাংসমর্যের
চতুর আঘাতে ক্লান্ত, তুমি তাকে কী ক'রে জাগাবে
হে বসন্ত, এ-চোখ আগের মতো সহজে জাগে না।

যে চোখ জাগ্রত ছিল উত্থিত সূর্যের মতো বিপ্লবের
বিদ্রোহী নীলিমায় সেই চোখ অবশেষে দেখেছে বিপ্লব,

আপন আত্মার পাশে দেখেছে মৃত্যুর অর্থ,
দেখেছে ধর্মের কালোমুখ,
ব্যর্থ স্বাধীনতা, দেখেছে স্বদেশ কাকে বলে

তুমি কোন্ সরল বিশ্বাসে মধ্যরাতে নাড়া দাও
জীবনের বন্ধ-দরোজায়, হে বসন্ত,
আমি একচোখে কখনো জাগি না
আমি একচোখে কিছুই দেখি না।

রাজদ্রোহী

আমার রক্তের মধ্যে লোহিত কণার মতো মিশে আছে
গণিকার ঠোঁটের লিপস্টিক, ধবল শঙ্খের দাঁত খুলে খুলে
সাজানো চুম্বন। কোন ব্যাধি আমাকে ছোঁবে না।

আমি এই শতাব্দীর গণঘৃণ্য রোগের সন্তান
কোনো পাপ আমাকে ছোঁবে না।
আমার হাতের মধ্যে স্বেচ্ছায় খুলে দেয়া বেশ্যার
রাজদ্রোহী স্তনের গর্জন, কোলাহল,
কোনো শৃংখল আমাকে ছোঁবে না।

আমার কণ্ঠের হাড়ে অহংকারী যুবতীর খোঁপার শেফালি,
মৃত্যুমাখা নীলপাট আমাকে ছোঁবে না।
আমার মাংসের মধ্যে লাল ঘুনপোকা, ছিন্ন পেশী-কণা,
কোনো প্রেম আমাকে ছোঁবে না। কোনো মৃত্যু আমাকে ছোঁবে না।

সকল ফাঁসির রজ্জু জ্বলে যাবে প্রচুম্বিত কণ্ঠনালী ছুঁয়ে,
ছিঁড়ে যাবে বেদনারভারে—মৃত্যুদণ্ড আমাকে ছোঁবে না।
কোনো শৃংখল আমাকে ছোঁবে না।

জন্মজটের ছায়া

একি শুধু হাতের তালুতে লাগা কাঁঠালের শাদা কষ
যে তুমি তেল দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে বুক থেকে তুলে দেবে তাকে ?

একি শুধু অঙ্গুরীয় ? অনামিকা গ্রাস করা শোভিত আকিক ?
যখন যেমন খুশী সাজাবে আঙুলে ? একি শুধু অযত্ন
লালিত চুলে বাউলের জট বেঁধে যাওয়া ?
একি শুধু লাল টিপ ? ডাগর চোখের নীচে কাজলের স্নেহ ?
যে তুমি আঙুল দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে তুলে দেবে সব !

এ বড়ো কঠিন কষ, অনেক সাধনা শেষে রক্তে পাওয়া স্মৃতি,
জন্ম-জটের মতো তোমার গ্রীবার ছায়া আজীবন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে।

প্রজ্বলন্ত অবতরণ

এবার আমি ভেঙে পড়বো
আকাশ থেকে প্রজ্বলন্ত
বিমান যেমন ভেঙে পড়ে,
তেমনি আমি ভেঙে পড়বো।

পাখার প্রতীক প্রপেলারে
শকুন যখন আগুন ছড়ায়
ঠিক তখনই ভেঙে পড়বো।
কোথায় পড়বো—কেউ কি জানি ?
কোথায় পড়বো কেউ জানি না ?

কেবল জানি পড়তে হবে
কোথাও আমার ভাঙতে হবে
বাজ পাখি তো প্রাণ দেবে না ?
আমিই শুধু জ্বলবো একা।
জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়বো
ভেঙে পড়বো, ভেঙে পড়বো
বিমান যেমন ভেঙে পড়ে।

আমায় একটু জায়গা দেবে ?
সমুদ্র কী পাহাড় চূড়ে
যেন ভেঙে পড়তে পারে
সাড়েতিনহাত শূন্য বিমান।

শকুন যখন আগুন ছড়ায়
তখন আমি ভেঙে পড়বো
আমাকে কেউ জায়গা দেবে
যেথায় আমি ভাঙতে পারি ?

তুমি ও আসন্ন বিপ্লব

আমারো রয়েছে ভয়,
সর্বহারার শৃঙ্খল শুধু নয়
বিপ্লব এলে তোমাকেও
হারাবার—যে তুমি
শৃঙ্খল হয়ে কোনোদিন
বাঁধো নি আমায়।

ভবিষ্যৎ

পরোয়া করি না কিছুদিন পরে কী হবে
ফুরাবে যখন তপ্ত-তুখোড় যৌবন,
তুমিতো আছোই আজীবন অবিবাহিত
দুজনেই হবো অবৈধ নিশি-নিদ্রায়।

তোমাকে ঘিরেই শব্দের কাছে যাওয়া
একটি নতুন কথা বলবার প্রেম।
আজীবন জানি পরস্পরের পাঠ্য।

পরোয়া করি না কিছুদিন পরে কী হবে
তুমিতো আছোই আজীবন অবিবাহিত।
হৃদয় এবং মননের ক্ষুধা তৃষ্ণায়
চার ফর্মার কালো চিৎকার বাজারে
মুগ্ধ-মলাটে প্রতি বৎসর বেরুবে,
জরীর বাঁধনে মহামায়া হবে কবিতা।

স্পর্শ

জন্ম আমাকে স্পর্শ করে নি
সূর্য আমাকে স্পর্শ করে নি
অগ্নি আমাকে স্পর্শ করে নি
ঘৃণা আমাকে স্পর্শ করে নি
মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করে নি
নারী আমাকে স্পর্শ করে নি
প্রেম আমাকে স্পর্শ করে নি।

দুঃখ আমাকে স্পর্শ করেছে,
স্পর্শ করেছে, স্পর্শ করেছে।

আমার দুপুর

প্রধানমন্ত্রীর করমর্দনের মধ্যে বন্দী
রাষ্ট্রদূতের সোনালি দুপুর-

সেনা বাহিনীতে পাসিং প্যারেডের প্রস্তুতি
ব্যাণ্ডপার্টিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মিহিসুর,
আমি রাজধানীর উন্মাতাল কেন্দ্রে সমাহিত।

আমার চারপাশে স্বপ্নভ্রষ্ট জনতার মতো
চোলাই মদের বহু ব্যবহৃত
শূন্য কলসের ছড়াছড়ি।

মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল নিয়ে
ফাই-ফর্মাশের লোভে বসে থাকা
পিতৃপরিচয়হীন
ক্লান্ত কিশোরের দিগ্বিজয়ী বেকারত্ব।

রাশান মিগের কান ঝালাপালা চিৎকারে
পাখিহীন,
প্রজাপতিহীন
ঢাকার আকাশ।

পতাকা শোভিত রেসকোর্স যেন রাজনীতির
মুক্ত যোনিমুখ
আমি জনৈক হিজড়ের করুণ কটিতে হাত রেখে
তল্লাস করছি স্বাধীনতা, পাখি, প্রজাপতি।

নামগোত্রহীন সেই হিজড়ের করুণ চিৎকারে
তার নৃত্যপটিয়সী
ঘুঙুর ও নূপুরের

উষ্ণ আলিঙ্গনে সম্মোহিত হয়ে আমি খুঁজছি সেই
অবলুপ্ত অজন্তার প্রেম, আর অপসৃয়মান বঙ্গদেশীয়
নারীর মোহিনী।

না রাজা, না রাজ্য

কেউ নয়, না রাজা না রাজ্য, শুধু রাজপথ চিনেছে আমাকে।

আমি কোনো রাজাকে চিনি না। আমি কোনো রাজাকে দেখি নি।
আমার চৈতন্যে কোনো চিরস্থায়ী রাজ্যভূমি নেই, রাজচিত্র নেই,
শুধু উপলব্ধি আছে এক পরিবর্তনশীল, অসহায় অস্থির মাতৃভূমির—
যে শুধু খণ্ডিত হয়ে ভেঙেচুরে সংকটে সংকীর্ণ হয়ে বারবার ভিন্নরূপে
সেজেছে স্বদেশ—অথচ জননী ব'লে আমি তাঁকে স্বীকার করেছি।

শুধু উপলব্ধি আছে এক শক্তিমন্ত নর-মুণ্ডের বীভৎস ছবির, যে এসে
রাজার নামে রাজ্যপাট করেছে শাসন, করেছে শোষণ, আর চৈতন্যের
ধ্বংসস্তূপের কালো ধুয়ার ভিতরে বারবার লুকিয়েছে মুখের আদল।
আমি তাই রাজাকে চিনি না। আমি কোনো রাজাকে দেখি নি।

কেউ নয়, না রাজা না রাজ্য, শুধু রাজপথ চিনেছে আমাকে।

ভাড়া বাড়ির গল্প

১

মৃত্যু আর জীবনের মাঝের দেয়াল
ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটু এগুলেই
আজিমপুরের পুরোনো কবর,
কিন্তু গোয়ালার গলি—গ্রীণ লেন।

ঘরের পাশেই তিনতলা ফ্ল্যাট।
রোদ্দুরে শুকোতে দেয়া সে-বাড়ির
শাড়ি ও ব্লাউজ কালেভদ্রে খ'সে পড়লে
যে-ঘরের ছাদ ধন্য হয়
গত পাঁচ বছর ধরেই
আমি সেই ঘরের ভাড়াটে।

'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে
বিশ টাকা ভাড়ায় ঢুকেছিলুম,
স্বাধীনতার বদৌলতে সেই ভাড়া বৃদ্ধির
উত্তপ্ত পারদ এসে ঠেকেছে পঞ্চাশে।

অথচ বাড়ির পাশের নোংরা ডোবা
কিম্বা পেছনের সংলগ্ন কবর—এ দু'য়ের
কোনোটাই উঠে যায় নি।
পাকিস্তানীরা চলে গেলে
ইরানী গোরস্থানের এক ইটের
দেয়াল ভেঙেছে বটে,
আমার তথৈ বচঃ।

না আসছে আলো, না আসছে হাওয়া।
শুধু টিনের চাল থেকে চুঁয়েপড়া
বৃষ্টির জল অবিরল ধারায় নেমেছে,
কোনদিন আমাকে ফাঁকি দেয় নি, এই যা।

আরশোলা, মাছিমশা কিম্বা প্রকৃতির
নতুন পতঙ্গের আনাগোনা
ইতিমধ্যে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেলেও
পাশের ফ্ল্যাটের শাড়িগুলো আপাততঃ
অনর্থক খ'সে পড়া স্থগিত রেখেছে।
যেন আমি আজকাল এইসব পছন্দ করি না।

যেন আমি শাড়ি নয়, নারী নয়,
মশা তাড়াতেই বেশি ভালবাসি।
যেন মশা তাড়ানোর জন্যেই আমার জন্ম।
আমার বড় হওয়া।

২

অতঃপর পাশের ফ্ল্যাটের সেই মেয়েটির
ধুমধাম করে সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে গেলে
লালপাড় শাড়ির বিপ্লব একদিন
চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলো।

তখন মৃত্যু আর জীবনের মাঝের দেয়াল
কেঁপে উঠলো,
খসে পড়লো ইটের গাঁথুনি,
এক
দুই
তিন ক'রে
ঘরের ভিতরে উঠে এলো সংলগ্ন কবর। হাড়গোড়।

ঘরময় তখন শুধু পাগলা শেয়ালের ছুটোছুটি,
মানুষের পচা মাংসের হুলুস্থুল
লাল কাফনের শাড়ি দিয়ে বাঁধা মৃত্যু আর
মৃত্যু
শুধু মৃত্যু
শুধু বাসা বদলের পালা, শুধু পাগলা শেয়ালের ছুটোছুটি।

৩

আমি এখন একটি নতুন একতলা ঘর খুঁজছি
কিন্তু গোয়ালার গলির ভিতরে হোক
ক্ষতি নেই। আমি চাই,
শুধু পাশে একটি তিনতলা ফ্ল্যাট থাকবে।
আমার ঘরের মধ্যে আলো না আসুক
হাওয়া না আসুক ক্ষতি নেই,
রোদ্রে শুকোতে দেয়া পাশের ফ্ল্যাটের
শাড়িগুলো কালে ভদ্রে
আমার ঘরের চালে খসে পড়ে
আমাকে জানিয়ে দেবে
নারী আছে, আজও আছে।

আমি সেই স্বপ্নের শাড়ি মুগ্ধ হাতে তুলে এনে
লাল বকুলের মালা গাঁথবো, আর
আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে ডাকবো
রীণা, উল্টোপাল্টা বাতাসে
তোমার শাড়ি উড়ে গিয়েছিল
আমি পেয়ে—ছি।